# নাট্যকারের সন্ধানে

অশোক মুখোপাধ্যায়

## পট-কথা

বহুদিন ধরে নাটকের কাজের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছি। নাটক লেখা থেকে শুরু করে সেই নাটকের পরিচালনা, তাতে অভিনয় এবং তার প্রযোজনা ও সংগঠনের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত সামলাতে হয়েছে। এখনও হয়। এইরকম আমি একা নই। আমার মতো অনেক নাট্যকর্মী নানা থিয়েটারের দলে এমনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করে চলেছেন। এই করতে করতে আমাদের হাল আমলের বাংলা নাটকের শক্তি এবং দুর্বলতা দুই বিষয়েই এক রকমের একটা ধারণা মনের মধ্যে তৈরি হয়ে উঠেছে। তার সবটাই সঠিক না হতেও পারে। না হবারই কথা। তবে নিশ্চয়ই সবটাই ভুল হতে পারে না। এই ভরসায় দু-চার কথা।

আমাদের এখনকার নাটকের দলগুলি যে-সব সমস্যায় জর্জরিত তাকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়: বাইরের সমস্যা এবং ভিতরের সমস্যা। বাইরের সমস্যা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি—টাকা-পয়সার সমস্যা, প্রেক্ষাগৃহ পাবার সমস্যা, রিহার্সালের জায়গা পাবার সমস্যা, প্রচারের সমস্যা, দর্শক পাওয়া-না-পাওয়ার সমস্যা, সংগঠনকে সক্রিয় ও সজীব রাখার সমস্যা ইত্যাদি। অন্যদিকে ভিতরের সমস্যা বলতে প্রধানত তিনরকম সমস্যার কথা আমার গোড়াতেই মনে আসে—নাটক করার নীতি ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সমস্যা, নাট্যপ্রয়োগের নানা শিল্পগত সমস্যা এবং ভাল নাটক রচনার সমস্যা।

বহিরঙ্গের সমস্যাগুলি নিয়ে এই লেখায় কোনও আলোচনায় ঢুকছি না। এমনিতেও মনে হয়, যাঁরা আমাদের মতো দলগুলির নাটক দেখেন বা এই রকম নাটক করার সমস্যা বিষয়ে একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা ওইসব বাইরের সমস্যাগুলির কথাও অল্পবিস্তর জানেন। ভিতরের সমস্যার মধ্যে নীতি ও আদর্শসংক্রান্ত প্রথম প্রশ্নটিও এই আলোচনার পরিধির বাইরে রাখতে চাই। সমস্যাটি জটিল ও স্পর্শকাতর এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে নিয়ত পরিবর্তমান। তা ছাড়া আমি ঠিক এই কাজ করার যোগ্য লোকও নই। যেহেতু আমি কাজটার একেবারে মাঝখানে আছি, এবং একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি, সুতরাং আমার নীতি ও আদর্শ কখন কীভাবে পাল্টে যাচ্ছে, কোন দিকে চলছি আমি, এর সবটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়। যাঁরা একটু দূর থেকে আমাকে বা আমার মতো নাট্যকর্মীদের দেখছেন, তাঁরাই এটা বেশি বুঝবেন। আমাদের নীতি ও

আদর্শ বিষয়ে আমরাই কিছু বলতে থাকলে সেটা অনেকটাই সাফাই গাওয়ার মতো শোনাতে বাধ্য। তাই সে-কাজে আমার রুচি নেই।

দ্বিতীয় সমস্যাটির আলোচনা ও বিশ্লেষণ খুবই গোলমেলে কাজ। নাটকের মঞ্চরূপ নির্মাণে প্রয়োগের নানা সমস্যা দেখা দেয়। মূলত শৈল্পিক সেই সব সমস্যার সঙ্গে আর্থিক এবং সাংগঠনিক প্রশ্নও দিব্যি জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ কোনও নাটকের মঞ্চ-স্থাপত্য এমন হতে পারবে না যার জন্য খরচ পড়বে দলের ক্ষমতার বাইরে। এমনই পোশাক-আশাক, আলো, সঙ্গীত ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা। তার মানে কল্পনার এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে বাস্তব সামর্থের একটা আপোস ও সামঞ্জস্য করেই গোটা কাজটা হয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে আবার অন্য ধরনের সীমাবদ্ধতা। দলে যে-সব অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন তাঁদের দিয়েই তো করতে হবে নাটক, তা সে যে-নাটকই হোক না কেন। তার মানে নাটক বাছার সময়েও দলীয় অভিনয়-ক্ষমতার সীমা ও সম্ভাবনার কথা ভাবতেই হচ্ছে প্রযোজককে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই শিল্পসৃষ্টির সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটা বাস্তব ও সম্ভাব্য সীমারেখার মধ্যেই করতে হচ্ছে। এই ঘর্ষণ থেকে সৃজন হচ্ছে ঠিক কীভাবে, তার আকর্ষণীয় আলোচনাও আমার এ-লেখার বাইরে।

## নাটকের ঐতিহ্য

ভিতরের সমস্যাগুলির মধ্যে যেটি তৃতীয়, অর্থাৎ ভাল নাটক রচনার সমস্যা, তাই নিয়ে দুচারটে কথা তুলতে চাই। খুবই পুরনো সমস্যা। আমাদের এই আধুনিক বাংলা নাটক যতদিনের সমস্যাটাও ততদিনের। বাংলা থিয়াটারের আধুনিক পর্ব শুরু হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৪-এর ক্রান্তিকারী প্রযোজনা "নবান্ন"-কে নতুন থিয়েটারের সূচনার দিকচিহ্ন বলে রায় দেন অনেকে। তার আগেও যদিও দুচারটি মূল্যবান প্রযোজনা হয়েছে, তবে সে-ও '৪২-'৪৩-এ। এই গত পঞ্চাশ বছরে থিয়েটার যে-রকম এগিয়েছে নাট্যসাহিত্য মোটেই তেমন নয়, এ-কথা অনেকের মুখে হামেশাই শোনা যায়। প্রযোজনার পারিপাট্যে, অভিনয়ের শক্তিতে, আঙ্গিকের চমকে দুর্বল নাটকও উতরে যাচ্ছে এ-কালের শক্তিশালী প্রযোজক-দের হাতে, কিন্তু ভাল নাটকের অভাব তাতে চাপা পড়ছে না, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে এই খেদোক্তি উচ্চারণ করেন বহু সুধীজন।

অভিযোগটি মূলত সত্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের গড্ডল-প্রবাহের বাইরে অন্য যে থিয়েটার গড়ে উঠেছে তার একটি প্রধান দারিদ্র ভাল নাটকের অভাব। কিন্তু এ-কথা বলার সময় মনে রাখা হয় কি যে, ভাল নাটক বাংলায় কোনও দিনই ভুরি-ভুরি লেখা হয়নি? যাঁরা একালের থিয়েটারের এই অভাব বিষয়ে প্রায়ই অনুশোচনা করেন তাঁরা ভুলে যান না তো যে, ১৯৪৪-এর আগে সত্তর বছরের যে পেশাদারী মঞ্চের ইতিহাস, সেখানেও ভাল নাটকের ও নাট্যকারের সংখ্যা নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়? আমার কিরকম মনে হয় যে

এইরকম একটা ভুল-বোঝা, অনেকের মধ্যে দানা বেঁধে আছে। যে দুর্দান্ত সব লোকেরা দুরন্ত সব নাটক লিখেছিলেন ১৮৭২ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত, হঠাৎ ১৯৪৪ থেকে কিছু খারাপ লোকজন থিয়েটারে ঢুকে পড়ে ভাল নাটক লেখার প্রবল স্রোতের উৎসমুখে পাথর-চাপা দিয়ে দিয়েছেন। এঁরা পারলে অন্নদাশঙ্করের সেই বিখ্যাত ছড়ার সঙ্গে দু-লাইন যোগ করে দিলে বড় খুশি হন : নাটকের কেন হয়নি সৃষ্টি ? / তলে তলে কেডা ? কমিউনিস্ট।

আধুনিক থিয়েটারে নাটকের অভাব বিষয়ে কোনও কথা বলতে গেলে দিশি নাটকের এই দুর্বল ঐতিহ্যের কথা মনে রাখা জরুরি। দেশপ্রেমের তাগিদে অনেক শিক্ষিত বঙ্গসন্তান এ কথা মানতে রাজি হন না। অনেকে মনে-মনে মেনেও মুখ বন্ধ করে থাকেন। কিন্তু তাতে সত্য পাল্টায় না। প্রাক—১৯৪৪ বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও নাট্যকারের নাম করা মুশকিল যিনি থিয়েটারের ছাত্রের গভীর অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন। হঠাৎ শুনলে কথাটা দুর্বিনীত ঠেকতে পারে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অপরেশচন্দ্র ইত্যাদি নাট্যকারদের রচনার কোনও তন্নিষ্ঠ পাঠ এবং প্রযোজনার প্রয়াস চলছে কি এযুগে ? এঁদের কিছু-কিছু বিক্ষিপ্ত রচনার সাফল্য সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে নিজস্ব বক্তব্য, ব্যক্তিগত শৈলী এবং ক্রমান্বিত প্রগতির লক্ষণে চিহ্নিত কি এঁরা কেউ ? এঁদের কাউকে নিয়ে ঘণ্টা-দুয়েক সিরিয়াস আলোচনা করতে পারেন কি পাঁচজন শিক্ষিত নাট্যপ্রেমী বাঙালি ? বস্তুত এই সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন কেউ নেই যাঁর কোনও স্বতন্ত্র বোধ ছিল থিয়েটার বিষয়ে, নাট্যরচনা ও প্রযোজনা বিষয়ে ভাবনাচিন্তা এযুগের নাটকের ছাত্রেরও অবশ্য অনুধাবনযোগ্য।

এবং এমন যে রবীন্দ্রনাথ, মনে রাখতে হবে, বাংলা থিয়েটারের শতাব্দীর ইতিহাসে তিনিই সত্যিকারের আউটসাইডার। ঐতিহ্যবিরোধী তিনি, আধুনিক। ভাবনার জগতকে থিয়েটারে হাজির করার পথ খুঁজেছিলেন তিনি, শুধু ঘটনার জগতকে নয়। তাঁর কাব্যপ্রতিভা তাঁর নাট্যশরীরের শিরায়-উপশিরায় উপস্থিত। সর্বোপরি, তাঁর সময়কার ইংরেজি-নবীশ থিয়েটারের চালচলন পছন্দ হয়নি। ভারতীয় থিয়েটারের নিজস্ব রূপ বিষয়ে তাঁর ছিল প্রখর অন্বেষা। নিজের নাটক পেশাদারি থিয়েটারে অভিনয় হলে, আপত্তি যেমন করেননি, আগ্রহও দেখাননি তেমন। নিজের নাটক কেমনভাবে মঞ্চায়িত হলে তার অন্তরীণ বৈশিষ্ট্যটুকু সবচেয়ে ভাল প্রকাশ পাবে, এ নিয়ে তাঁর ভাবনাকে হাতেকলমে রূপায়ণেও অনলস ছিলেন। জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত সারাজীবন বহুবার নাট্য প্রযোজনা করেছেন তিনি। পেশাদারি থিয়েটারের পাশাপাশি আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত থিয়েটারের ঐতিহ্যসৃষ্টিতে সক্রিয় ছিলেন বরাবর। আশ্চর্য কী যে, তাঁর সমকাল তাঁর থিয়েটারকে বুঝতে পারেনি এবং বুঝতে চায়নি। ওভারকোটের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কটিও ক্লোকরুমে জমা দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার ইংরেজি অভ্যাসটি ততদিনে বাবু বাঙালি ভালই শিখে ফেলেছিলেন।

তার থেকেও বড় দুঃখ এই যে, আমাদের গত অর্ধশতাব্দীর আধুনিক বাংলা থিয়েটারও তাঁকে আত্মস্থ করতে পারল না। এই আধুনিক থিয়েটারের যেটা শক্তি, রবীন্দ্রনাথের মোকাবিলায় সেটাই তার প্রধান দুর্বলতা হয়ে দাঁড়াল। মূলত ইংরেজি জানা এই নাট্যকর্মীরা পাশ্চাত্য থিয়েটারের প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে-হতে দেখলেন, এদের কোনটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথকে মেলানো যায় না। তিনি সম্পূর্ণভাবেই স্বদেশী এবং গভীর অর্থে মৌলিক। নতুন থিয়েটারের কর্মীরা বর্ণসঙ্কর। দেশি-বিদেশি টানাপোড়েনে জেরবার এই নাট্যকর্মীরা তাই আজও আত্মপরিচয় খুঁজে পাননি। তাই গভীর অপরিচয়ের সেতুর এপারে-ওপারে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা থিয়েটার। শম্ভু মিত্র ও বহুরূপীর দীপ্ত সাফল্য সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনও আন্তরিক তাগিদই তৈরি হতে পারল না এযুগের শক্তিশালী প্রযোজক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে।

আমাদের আধুনিক নাট্যআন্দোলনের পটভূমিতে নিহিত রয়েছে ইতিহাসের এই আয়রনি, একথা মনে রাখতে হবে। স্বদেশী নাটকের দুর্বল ঐতিহ্যের মধ্যে একমাত্র যে স্বদেশী নাট্যকার মুক্তির নির্দেশ বহন করেছিলেন, যাঁর নাট্যসৃষ্টি সাহিত্য হিসাবেও উঁচুদরের আবার থিয়েটার হিসাবেও প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জিং, তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আধুনিক নাট্যকর্মীর বোধের দিগন্তের বাইরে। তাঁর নাট্যরচনা ও প্রযোজনার কোথাও তিনি তাঁর উত্তরাধিকারের শ্রেষ্ঠ অংশটুকুকে, রবীন্দ্রনাথকে, ব্যবহার করতে পারলেন না।

## থিয়েটারের নতুন ঘরানা

চারের দশকের গোড়ায় যে নবনাট্য জন্ম নিয়েছিল, আজ নয়ের দশকের প্রারম্ভে পৌঁছে যে থিয়েটার বাঙালির গর্ব, সে তার আগের যুগের থিয়েটারের থেকে কোথায় আলাদা? কেন সে সূচনা করতে পারল এক নতুন ঐতিহ্যের? আধুনিক থিয়েটারের স্বতন্ত্র চরিত্রকে খানিকটা বুঝতে পারলে, এই থিয়েটারের নাটক ও নাট্যকারকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য হতে পারে।

নবনাট্যের প্রথম স্বাতন্ত্র এর সামাজিক অবস্থানে। ১৮৭২-এর নীলদর্পণ-এর টিকিট-বিক্রি-করা অভিনয় থেকে গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখর-অমৃতলাল থেকে, শিশির-অহীন্দ্র-নরেশ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার পেশাদারি মঞ্চের সীমানায় লালিত হয়েছে। অপেশাদারি থিয়েটার বলতে তখন বোঝাত শৌখিন থিয়েটার। বাবু-বাড়ির অনিয়মিত শখ-মেটাবার থিয়েটার। একে কেউ সিরিয়াসলি নিত না। এই দুই বড় ও ছোট গণ্ডির বাইরে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার চলেছিল আপনপথে, বাঙালির থিয়েটারের মূল স্রোতের থেকে দূরে। চার দশকের গোড়ায় নতুন থিয়েটার এসে হাজির হল বিদ্রোহের মতো। ক্লান্ত বয়স্ক পেশাদার থিয়েটারকে নানা দিক থেকে আক্রমণ করল এই বিকল্প থিয়েটার। সেই আক্রমণ যতটাই আদর্শের দিক থেকে, বিষয়ের দিক থেকে, ততটাই আবার রূপের বা প্রকরণের দিক থেকেও।

জবানবন্দী, আগুন, নবান্ন, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি গণনাট্য সঙ্ঘের গোড়ার দিকের প্রযোজনাগুলির নতুনত্ব কি এই যে তারা গরিব লোকের কথা বলল ? গরিব লোক তো বাংলা নাটকের জন্মলগ্নেই বড়-সড় জায়গা পেয়েছিল। তারপরেও শুধু রাজারাজড়ার গল্প তো বলেনি বাংলা থিয়েটার। সাধারণ মানুষ এমনকি শোষিত মানুষের কথাও বলেছে। ইংরেজের অত্যাচারের কথা বলেছে। দেশি ভূস্বামীকেও রেহাই দেয়নি। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মুখর হয়েছে। কিন্তু গণনাট্যের নাটকে সমস্ত সামাজিক ও ব্যক্তিক সমস্যাগুলিকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার আন্তরিক প্রবণতা লক্ষ করা গেল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অপরিহার্য উপস্থিতিকে আবিষ্কার করল এই নতুন নাটকগুলি। সমস্ত সমস্যাকে এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে চাইল। অর্থাৎ এক কথায় 'ঘোরতর 'কমিউনিস্ট'। সঙ্গে-সঙ্গে এই নাটকের প্রযোজনার ভঙ্গিতেও এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মঞ্চনির্মাণে, আলোর ব্যবহারে, রূপসজ্জায়, অভিনয়ে এল নতুন যত্ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা। থিয়েটারের নতুন ভাষা আবিষ্কারের জন্য শুরু হল যথেবদ্ধ প্রয়াস। থিয়েটার আর শুধু প্রমোদের বাহন রইল না। সামাজিক দায়িত্ব মেনে নিয়ে, বুদ্ধির ভূমিকাকে মেনে নিয়ে, থিয়েটারকে একটি 'সিরিয়াস আর্ট ফর্ম'' করে তোলার কাজ শুরু করলেন নতুন নাট্যকর্মীরা।

এই নাট্যকর্মীরা এঁদের সামাজিক অবস্থান এবং বুদ্ধিগত ঝোঁক দিয়ে বহুপরিমাণে প্রভাবিত করলেন নতুন থিয়েটারের চরিত্রকে। মূলত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং কদাচিৎ মধ্যবিত্ত স্তর থেকে উঠে আসা এই থিয়েটারকর্মীরা পয়সা পাবেন না জেনেই থিয়েটারে এসেছিলেন। থিয়েটারকে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা অর্পণ করেছিলেন। এঁদেরই বেহিসেবি পাগলামিকে পুঁজি করে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলা থিয়েটার ধনী হয়েছে। গণনাট্য-নবনাট্য-গ্রুপ থিয়েটার—নানা স্তর ও ধাপে-ধাপে গড়ে উঠেছে, আধুনিক বাংলা নাট্যের ইমারত এঁদেরই হাতে। এঁদের মধ্যে প্রথিতযশা অনেকেই পরে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলেছেন, একথা ঠিক। অনেকে ক্লান্ত হয়ে চলা থামিয়েছেন। অনেকে পেশাদারি জগতের প্রবল হাতছানির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অনেকের আবার দু-নৌকাতে পা। তবু এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা হাল ছাড়েননি। শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবাংলাতেই নয়, বাংলার বাইরেও যেখানেই বাঙালি সেখানেই এই অন্য থিয়েটারের বীজ হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছে। ফসল ফলাচ্ছে। অফিস ক্লাবের নাটকেও এখন দায়িত্বের ছোঁয়াচ লাগছে। যাত্রা, টি.ভি. আর পেশাদারি থিয়েটারের প্রচণ্ড হই-হল্লার মধ্যেও বাঙালি তার আদরের এই নতুন থিয়েটারকে পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছে, রাখছে, এ এক দারুণ ব্যাপার। অন্য থিয়েটারের এই ব্যাপক ভূমিকা এবং দীর্ঘ পরমায়ু পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায়নি।

তারপরেও, এত কিছুর পরেও, হঠাৎ এক-একটা অবুঝ গলা অন্ধকারে ফিসফিস করে, নাটক কই ? নাটক নেই কেন ? ভাল নাটক নেই, সেখানে ভাল থিয়েটার কি সম্ভব ? এইসব কথাকে আত্মতৃপ্তির ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। কারণ নাটকের অভাবের

কথা যাঁরা তুলছেন তাঁদের মধ্যে শুধু দর্শক সমালোচকরাই নেই, আছেন নাটকের কর্মী এবং কারিগররাও। কেন নাটকের অভাব এবং এই অভাব কতটা ব্যাপক, তা জানার জন্য এইবার আধুনিক নাটকের দিকে তাকানো যাক।

## বাংলা নাটক রচনার সমস্যা

নাটক একদম নেই—একেবারেই লেখা হচ্ছে না—একথা অবশ্য সত্য নয়। নাটক লেখা হচ্ছে প্রচুর—তবে যত নাটক লেখা হচ্ছে তত ভাল নাটক লেখা হচ্ছে না, একথা নিশ্চয়ই সত্য। তাতে এমনিতে ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। সব দেশেই শিল্পের সমস্ত মাধ্যমেই প্রচুর সাধারণ কাজের সঙ্গে অল্প কিছু ভাল জিনিস তৈরি হয়। কিন্তু নাটক লেখাটা যেখানে একটা নিজস্ব চরিত্র খুঁজে পেয়ে গেছে, সেখানে ভাল-খারাপের একটা মানদণ্ড, একটা বোধও গড়ে উঠেছে নাট্যকর্মী ও দর্শকদের মধ্যে। আমাদের এখানে নাটক সাহিত্য হিসাবে সেই পরিণতি পায়নি বলেই (যেমন পেয়েছে কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস) ভিড়ের মধ্যে মুড়ি-মিছরির একদর হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শক্তিমান প্রযোজক এবং সক্ষম নাট্যদলগুলির হাতে সাধারণ নাটকও আকর্ষণীয় চেহারা পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে ভেতরের নিঃস্বতা সব সময়ে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। সত্যিকারের নাট্যপ্রেমীদের আশঙ্কার বীজও এখানেই নিহিত।

এখন মুশকিলটা হচ্ছে, ভাল নাটকের অভাবে থিয়েটার থেমে থাকবে না। ক্ষুধার সময় পুষ্টিকর সুখাদ্য না পেলে ভক্ষণীয় যা হাতের কাছে পাওয়া যাবে তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে শরীর-স্বাস্থ্যের হাল তাতে যাই হোক না কেন! এই নিয়মেই মঞ্চের গড়ুরের ক্ষুধা মেটাতে নাট্যকর্মীদেরই এগিয়ে আসতে হয়েছে এবং হচ্ছে। নিজেদের নাটক তারা নিজেরাই তৈরি করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এইভাবে দলগুলির নিজেদের নাটক লেখার লোক তৈরি হচ্ছে। প্রয়োজনের চাপে লেখা এইসব নাটক দলের অবস্থা ও সামর্থের কথা ভেবে সতর্ক কায়দায় 'নির্মিত' হয়। কৌশল স্বভাবতই এগুলির মূল শক্তি। শিল্পসৃষ্টির ভিতরের তাগিদ এখানে নানা বাইরের শর্তের দ্বারা খর্বিত।

মূলত এই প্রয়োজনের ধাক্কাতেই অনুবাদিত রূপান্তরিত নাটকের এত সংখ্যাধিক্য গত চল্লিশ বছর ধরে। অনুবাদ-রূপান্তর এমনিতে ভালই। যে-কোনও থিয়েটারকে এবং তার নাটকের ভাণ্ডারকে ধনী করে এই প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক নাটকের ঐতিহ্য ও আবহাওয়ার সঙ্গে দেশি থিয়েটারের যোগাযোগ ঘটে। ঈসকাইলাস থেকে অলবি পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন নাটকারদের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের পরিচয় গত চল্লিশ বছরে এই নাট্যদলগুলির জন্যই সম্ভব হয়েছে। এই সংযোগ নিশ্চয়ই আমাদের থিয়েটারকে পরিণতি ও প্রাপ্তমনস্কতা অর্জনে সাহায্য করেছে। অনেকেই অসামান্য শক্তির পরিচয়ও দেখিয়েছেন কখনও-কখনও এই কাজে। বিশেষ করে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তো এক্ষেত্রে বলতেই হয়। চেখভ, পিরানদেল্লো, ব্রেখট বা তলস্তয়ের

নাটককে নিছক রূপান্তর নয় পুনর্সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন তিনি। মৌলিক নাট্যকারের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি যদি তাঁর অনায়ত্বও থেকে যায় তবু বাংলা নাটক ও নাট্যের দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়েছে তাঁর নাট্যসৃজন একথা কে অস্বীকার করবে? দলের প্রয়োজনে নাটক লিখেও অনুবাদ, রূপান্তর এমনকি মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এমন কয়েকজন যাঁদের নামোল্লেখ নিতান্তই প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে আছেন শম্ভু মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জোছন দস্তিদার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অসিত বসু, উমানাথ ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম চৌধুরী প্রমুখ (কেউ কেউ বর্তমান প্রতিবেদককেও হয়ত এই তালিকাভুক্ত হবার সম্মান দিতে পারেন)। কোনও গোষ্ঠীভুক্ত নন অথচ বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি ভাল নাটক লিখেছেন তুলসী লাহিড়ী, বীরু মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপে মিত্র প্রমুখ। কিন্তু এঁদের সকলের মিলিত সৃষ্টিতেও বাংলা নাটকের মৌলিক ধারা গড়ে ওঠেনি। বিদেশি নাটকের প্রভাবে ভাল যেমন হয়েছে তেমনি খারাপও হয়েছে। বুদ্ধিজীবী দর্শকের আদরের বস্তু হলেও এ নাটক সাধারণ বাঙালি দর্শকের হৃদয়-মনের খোরাক হয়ে উঠতে পারেনি।

ভাল নাটক রচিত হবার আরেকটি প্রাথমিক শর্ত আমাদের থিয়েটারে মর্মান্তিকভাবে অপূরিত থেকে যাচ্ছে। তা হল, শক্তিমান কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে মঞ্চের যোগাযোগের অভাব। এ নিয়ে আমাদের মতো নাট্যকর্মীদের অভিযোগ বহুদিনের। এক সময়ে যখন থিয়েটার সম্যক পরিণতি পায়নি তখন বরঞ্চ সাহিত্যিকদের সঙ্গে মঞ্চের যোগাযোগ ছিল অনেক বেশি। শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর অনেকেই নাটকের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু থিয়েটার যখন সিরিয়াস নাট্যগোষ্ঠীদের চর্চায় সুধীজনের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল তখন থেকেই তার সঙ্গে সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক স্থায়ী হয়ে গেল। কেন? পেশাদারি মঞ্চও যদি এঁদের শিল্পীসত্তাকে আকর্ষণ করতে না-ও পেরে থাকে, অন্য থিয়েটারের জন্য তো এঁরা লিখতে পারতেন। পারেন। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গেই তো বহু ক্ষমতাবান নাট্যপ্রযোজকের বন্ধুত্বও আছে। সাহিত্যিকরা অনেকেই নতুন নাটকের ভাল দর্শকও। তবুও এঁরা কেউ নাটক লেখার তাগিদ কেন অনুভব করলেন না, এর উত্তর আমার জানা নেই। তাই একমাত্র বুদ্ধদেব বসুর একক, যদিচ ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া কারও কোনও নাম উল্লেখ করা যায় না। মঞ্চের সঙ্গে গভীর অপরিচয়ের জন্য বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলিও অবশ্য কাগজের ফুলল হয়েই থাকল।

কাব্যনাটকের ক্ষেত্রেও যে-ব্যর্থতা কবিদের অভিজ্ঞতা তার মূলেও মঞ্চকে না জানা এই মৌল অসুবিধা কাজ করেছে। নইলে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু বা দিলীপ রায়ের হাতে কাব্যনাটকের যে-রকম সম্ভাবনাময় সূত্রপাত হয়েছিল, থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে, এপথে বাংলা নাটকের মুক্তির অন্যতর মাত্রার সন্ধান পাওয়া যেত হয়ত। তাই বিসর্জন বা কর্ণকুন্তীসংবাদ-এর মতো মহৎ প্রাক-দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আধুনিক

বাংলা কাব্যনাটকের ভ্রূণাবস্থায় বিনাশ ঘটল।

## প্রধান পঞ্চজন

তবে কি গত অর্ধশতাব্দীর নাট্যআন্দোলন কোনও নাট্যকারের জন্ম দেয়নি? কোনও নাম করা যায় না যা নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ উপাধিতে ভূষিত হতে পারে? সৌভাগ্যবশত এর উত্তর নেতিবাচক নয়। নাট্যকার হিসাবে যাঁদের উপস্থিতি গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের থিয়েটারে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের নাম আমার সবচেয়ে আগে মনে আসে। তার মানে এই নয় যে, আর কেউ ভাল নাটক লেখেননি এই সময়-পর্বে। কিন্তু এঁদের মধ্যে বিষয় ও রূপের যে বিবর্তন লক্ষ করা যায়, নাটকের অর্থ ও ব্যবহার প্রসঙ্গে যে অনুসন্ধানী মনোভাব এঁদেরকে চালিত করে এবং নাটক ও থিয়েটারের সংগ্রাম ও সঙ্গম বিষয়ে এঁদের যে অবাহিতি, সব মিলিয়ে এঁদের একটা লাগাতার চরিত্র গড়ে উঠেছে, যা অন্যদের বিক্ষিপ্ত ভাল কাজের মধ্যে পাওয়া যায় না। এঁরা হলেন বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মনোজ মিত্র। কী নাটক লিখব, কেন নাটক লিখব, কাদের জন্য লিখব এবং কীরকমভাবে লিখব—এইসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে এঁরা কেউ এক কথা বলবেন না, তা আমি জানি, আপনারাও জানেন। এঁদের একমাত্র সাধারণ চরিত্র হচ্ছে, পাঠক লক্ষ করবেন এঁরা প্রত্যেকেই আধুনিক বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে প্রবল ঘনিষ্ঠতায় জড়িত। বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার, উৎপল দত্ত বা মনোজ মিত্র প্রত্যেকেই শক্তিশালী প্রযোজক—অভিনেতা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তা না হয়েও হয়ে উঠেছেন থিয়েটারের এক প্রতিষ্ঠান। কোনও দলের না হয়েও কলকাতার থিয়েটারের নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন মোহিত। আমার ধারণা, আধুনিক বাংলা নাটকের যে-কোনও ছাত্রের কাছে নাট্যকার হিসাবে এঁরাই সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবি করতে পারেন।

এঁদের মধ্যে প্রবীণতম বিজন ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক বাংলা থিয়েটারের অন্যতম স্রষ্টা। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম দিককার স্মরণীয় প্রযোজনাগুলির মধ্যে জবানবন্দী এবং নবান্ন-র তিনিই নাট্যকার-পরিচালক, যদিও নবান্ন-তে তাঁর সঙ্গে যৌথ-নির্দেশক ছিলেন শম্ভু মিত্র। নবান্ন নাটক হিসাবে আজ আর খুব শক্তিশালী ঠেকে না হয়ত। কিন্তু পাঁচের দশকে লেখা তাঁর মরা চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষ, গোত্রান্তর বা ছয়পথ যাঁরা পড়েছেন, বা ছয়ের দশকের দেবী গর্জন ও গর্ভবতী জননী, এবং সাতের দশকের চলো সাগরে, হাঁসখালির হাঁস বা লাশ ঘুইর‍্যা যাউক, তাঁরা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের প্রচণ্ড ক্ষমতার কথা তর্কহীনভাবেই মেনে নেবেন মনে হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবানের লোভ ও অত্যাচার এবং দুর্বলের অসহায় যন্ত্রণা ও প্রতিরোধের স্পৃহা এবং প্রয়াস, এক কথায় এই যদিও তাঁর নাট্যবিষয়, তবু অনায়াসে তিনি রহস্যময় আদিম জীবনের সীমানায় নিয়ে যান পাঠককে। মানুষের যন্ত্রণার কাব্যরূপ নির্মিত হয় তাঁর নাটকে, যদিও সে কবিতা মেহনতি মানুষের ঘাম ও রক্তে ভেজা সংলাপের সঙ্গে অনায়াসে সহাবস্থান করে।

উৎপল দত্ত, বাদল সরকার বা মোহিত চট্টোপাধ্যায় যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক চেতনার থিয়েটার তৈরি করেন, বিজন ভট্টাচার্য সেখানে যাত্রা শুরুই করেন দেশজ জীবনের মর্মমূল থেকে। তাঁর নাটকের কাঠামোতেও তাই সারল্য, বলিষ্ঠতা ও কবিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসে যায়। তাঁর উত্তরসূরী মনোজ মিত্রের নাট্যকার-স্বভাবের আলোচনায় এ-প্রসঙ্গ ফিরে আসবে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তাঁর প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিনী নয়। ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার তিনি করেননি। তবু গত অর্ধশতাব্দীর বাংলা নাটকে তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও জোরালো।

কম লেখার অভিযোগ উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে করা যায় না একেবারেই। চল্লিশ বছর ধরে নাটকের দলচালানোর ঝক্কি বহন করছেন। এর মধ্যে একবার প্রায় একদশক জুড়ে একটি মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেছেন তাঁর দলকে নিয়ে। যাত্রাজগতে নাট্যকার-নির্দেশকের কাজ করেছেন। হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসাবেও তিনি খুবই ব্যস্ত। এরই সঙ্গে একটি নাট্যপত্রিকা চালাচ্ছেন দীর্ঘদিন। তাঁর নাটকে তিনি ক্লান্তিহীন ভাবে প্রচারধর্মী। সারা পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাস ও নাটক ঘেঁটে তিনি অনবরত মানুষের সংগ্রামের কাহিনী জোগার করে আনছেন তাঁর নাটকে। শেকসপীয়ার এবং গোর্কির অনুবাদ-নাট্যরূপে তাঁর যেমন সিদ্ধি, তেমনি অ্যাজিট-প্রপ নাটকের অস্ত্রকে ধারালো করে তুলতে তিনি নিরন্তর যত্নবান। উইট বা ঝাঁঝালো হাসারস তাঁর বিশেষ লক্ষণ। তাঁর নাটকের কোনও সামগ্রিক মূল্যায়ন এখানে ঈপ্সিত নয়, সম্ভবও নয়। তবে মানুষের অধিকারের মতো ডকুমেন্টারি নাটক বা টিনের তলোয়ার-এর মতো হাস্যোজ্জ্বল বর্ণময় অথচ বিষণ্ণ নাটক যিনি লিখেছেন, তাঁর নাট্যকর্মের মনোযোগী বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। পুনরুচ্চারণ এবং সরলীকরণে দুষ্ট তাঁর বহু নাটকই। সাদা ও কালোর মাঝখানে কোনও রঙ থাকে না। রাজনৈতিক প্রচারের স্বার্থে তিনি হামেশাই পরিহার করেন জীবনের মনোগ্রাহী জটিলতা। আবেগের গভীরতর স্তরকে ছুঁতে তিনি প্রায়শই ব্যর্থ বা অনিচ্ছুক। এ সব অভিযোগ যদিও সত্য হয়, তবু এ-ও তো সত্য যে নাট্যগ্রহী বাঙালির মনের ওপর তাঁর দখলও বিশাল। তাঁর সেই উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার অনেকটাই অভিনেতা-প্রযোজক উৎপল দত্তের পাওনা হলেও, নাট্যকার উৎপল দত্তের ভাগও সেখানে নগণ্য নয়। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করলেই তাঁর শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাদল সরকারের নাট্যকার-জীবনকে তিনটি পর্বে ভেঙে দেখা যায়। বিদেশ যাবার আগের বাদল সরকার যিনি বড় পিসিমা বা সলিউশন একস-এর মতো মজার নাটক লিখেছেন ; আফ্রিকা-ইয়োরোপ ফেরত যে বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া-র মতো নাটকে আধুনিক জীবনের শূন্যতা, রক্তহীনতা ও পাপবোধের দলিল রচনা করেছেন ; এবং তৃতীয় এক বাদল সরকার যিনি অঙ্গনমঞ্চের প্রবক্তা, যিনি স্পার্টাকুস, মিছিল, ভোমা, সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস ইত্যাদির মতো কমিটেড, বিদ্রোহী নাটক রচনা ও প্রযোজনায় নতুন পথের সন্ধানী। আমি প্রথম পর্বের কমেডি-রচয়িতা বাদল

সরকারের ভক্ত। তাঁর তৃতীয় পর্বের নাটকগুলিও সরাসরি কথাবলার ঋজুতায় চরিত্রবান। প্রায় প্রবন্ধ-রচনার মতোই আপাত-শিল্পহীন তাঁর ভঙ্গি, অথচ অমোঘ তাঁর লক্ষ্যভেদ। আক্রমণাত্মক তিনি, কিন্তু কখনওই সহজ উত্তেজনার শিকার নন নিজে। অন্যকেও নিছক উত্তেজনায় ভোলাতে চান না। বরঞ্চ মধ্যবর্তী পর্বের জীবন-বিতৃষ্ণ দার্শনিক বাদল সরকারকে আমার পছন্দ নয়, যদিও মধ্যপর্বের নাটকগুলির জন্যই তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি। এই পর্বে বরং আমার ভাল লাগে তীব্র সূচীমুখ ডকুমেণ্টারি ত্রিংশ শতাব্দী এবং মনোরম হুল্লোড়ের কমেডি বল্লভপুরের রূপকথা। দুঃখের বিষয়, নাট্যকার হিসাবে তাঁর বিবর্তন ও পর্বান্তরের রূপরেখা রচিত হয়নি আজও।

ছয়ের দশকের গোড়ায় কণ্ঠনালীতে সূর্য, শবাধারে জ্যোৎস্না বা গন্ধরাজের হাততালির-মতো অদ্ভুত নামওয়ালা কাব্যগন্ধী আপাত-দুর্বোধ্য কিছু নাটক নিয়ে থিয়েটারের জগতে এসেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। কবিতার ক্ষেত্রে তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত তরুণ। তবু নাটকের প্রকরণেই কথা বলতে চাইলেন তিনি। মেলাতে চাইলেন কবিতা ও নাটকের দিগন্তকে। প্রতীকের আবরণে বলতে চাইলেন কিছু অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের কথা যা নিতান্ত ব্যক্তিগতই নয় শুধু। চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড এবং মৃত্যুসংবাদ-এ তিনি খুঁজে পেলেন নিজস্ব ভঙ্গি এবং পেলেন একজন সমর্থ প্রযোজক শ্যামল ঘোষ। সাতের দশকের একেবারে গোড়ায় ক্যাপটেন হুররা ও রাজরক্ত অন্যতর এক মোহিত-কে উন্মোচিত করল। শ্যামল ঘোষ ও বিভাস চক্রবর্তীর প্রবল প্রযোজনায় এই দুটি নাটকে রাজনীতির ভাবনা অবয়ব পেল, কবিতা পেল স্পষ্টতা। এরপর নানাস্বাদ ও ভঙ্গিতে নাটক লিখেছেন মোহিত। বাঘবন্দী, স্বদেশী নকসা, তোতারাম, আলিবাবা বা সোক্রাতেস-এর মতো নানারকম নাটক। অতিসম্প্রতি তাঁর সুন্দর এবং তখন বিকেল মেলে ধরেছে আর এক মোহিতকে—যাঁর মধ্যে সৌন্দর্যতৃষ্ণা, হাস্যবোধ, বিষণ্ণতা মিলে-মিশে এক নতুন শিল্পীসত্তা। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আগামী নাট্যকর্মের ওপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে আছে বাংলা নাটকের ভবিষ্যত।

গত তিন দশকে যে নাট্যকার সবচেয়ে সহজ অথচ জোরালো ভঙ্গিতে বিকশিত হয়েছেন, আজ যাঁর নাট্যরচনাপ্রতিভা তুঙ্গবিন্দুতে, সেই মনোজ মিত্র একজন জনপ্রিয় অথচ অতীব ক্ষমতাশালী নাটকরচয়িতা। নানাধরনের নাটক তিনি লিখেছেন। শিবের অসাধ্য, নরক গুলজার, রাজদর্শন, সাজানো বাগান, মেষ ও রাক্ষস, নৈশভোজ, কেনারাম-বেচারাম এবং পরবাস-এর মতো নানা স্বাদের বিচিত্র কমেডির সম্ভার তাঁর সৃষ্টি। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বেদনা-কাব্যের মিশেলে এগুলি অনবদ্য। তেমনি নেকড়ে, চাকভাঙা মধু, অশ্বত্থামা, অলকানন্দার পুত্রকন্যা বা শোভাযাত্রা-য় রয়েছে জীবনের গভীরতর সত্যের অন্বেষণ, সম্পর্কের উন্মোচন, সমাজ-সত্য ও ব্যক্তি-সত্যকে পাশাপাশি রেখে দেখার ক্ষমতা। এরই সঙ্গে যদি টাপুর টুপুর, তক্ষক, কাল-বিহঙ্গ থেকে শুরু করে পাখি, প্রভাত-ফেরী বা আঁখি-পল্লব-এর মতো অসংখ্য স্মরণীয় একাঙ্কের কথা ভাবি, তাহলে বোঝা যাবে কত বিচিত্রগামী ও বিস্তৃত তাঁর সৃজনক্ষেত্র। প্রকাশিত কিন্তু এখনও অপ্রযোজিত দর্পণে

শরৎশর্মী নাটকে বিগত শতাব্দীর এক আশ্চর্য গল্পকে তুলে ধরেছেন মনোজ। প্রতিটি নাটকেই তিনি নব নিরীক্ষায় মাতছেন। ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নিজেকে প্রতিটি নাটকেই। শ্রেষ্ঠ হাসি থাকে চোখের জলের কাছাকাছি। সেই হাসি-কান্নার ছোঁয়ায় অপরূপ তাঁর নাটকে রয়েছে সহজ কবিতা। গ্রাম ও শহর একই সঙ্গে ধরা পড়ে তাঁর লেখায়। চরিত্রগুলি স্বচ্ছন্দময় তাই সত্যপ্রতিম হয়ে ওঠে। অভিনেতা-প্রযোজক মনোজের খ্যাতির সঙ্গে সমান্তরাল নাট্যকার মনোজের দুর্ণিবার জনপ্রিয়তা। মোহিতের মতোই মনোজ আর এক আলোক-বর্তিকা আধুনিক বাংলা নাটকে।

## শেষ নাহি যে

প্রধান পাঁচ বাঙালি নাট্যকারের নাট্যকর্মের সামগ্রিক কোনও মূল্যায়ন বা ব্যাপক কোনও আলোচনা আমি এ-লেখায় করতে চাইছি না। আমার সে ক্ষমতাও হয়ত নেই। আমি শুধু বলতে চেয়েছি, এঁদের রচনায় আধুনিক বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ সীমানাগুলিকে পাওয়া যাবে। এঁদের মধ্যে ধরা পড়েছে যুগ ও সময়ের প্রধান ঝোঁকগুলি। তেমনি থিয়েটারের নানা প্রয়োগগত নবীনতাও অনেক সময় এঁদের নাটকের প্রয়োজনার স্বার্থেই সৃষ্টি হয়েছে। খুবই দুঃখের কথা যে এঁদের নাটকের তন্বিষ্ঠ বিশ্লেষণ হল না আজও। অথচ বাংলা নাটকের রচনাগত সমস্যা ও সাফল্য বুঝতে হলে এই পাঁচজনের নাটকই তো পড়তে হবে সুগভীর অথচ নিরপেক্ষ মনোযোগ নিয়ে।

এঁদের পরে তরুণতর কিন্তু সম্ভাবনায় দীপ্ত আরও অন্তত দুজন নাট্যকারের কথা না বললে আমার এ-লেখা অসমাপ্ত থেকে যায়। এঁরা হলেন দেবাশিস মজুমদার ও চন্দন সেন। প্রেমচন্দ-এর গল্প অবলম্বনে রচিত দানসাগর-এ যে প্রতিশ্রুতি দেবাশিস দেখিয়েছিলেন, তারই সার্থক পরিণতিতে অমিতাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে স্বপ্নসন্ততি-তেও রয়েছে নিজস্ব ক্ষমতার দ্যুতি। দেবাশিসের ভাবনা ও রচনায় একটি বলিষ্ঠভাব আবিষ্কার করা যায়। অথচ তিনি নাগরিক জীবনের দমবন্ধকরা ক্লিন্নতাকেও চেনেন। স্বীকার করেন তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকেও। গল্পবলা ও চরিত্রায়নে আরেকটু মনুশিয়ানা আয়ত্ব হলেই তিনি হয়ে উঠবেন প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টা। বিদেশি নাটকের ছায়ায় গড়ে-ওঠা জ্ঞানবৃক্ষের ফল চন্দন সেনকে এনে দেয় ব্যাপক পরিচিতি। অতি-সম্প্রতি তাঁর রচিত দায়বদ্ধ-র তুমুল সাফল্য তাঁকে জনপ্রিয়ও করে তুলেছে। অন্তর্লীন আবেগের জোরালো উন্মোচনে বিশিষ্ট তাঁর ভঙ্গি। জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ব্যাপক। এর সঙ্গে রয়েছে সামাজিক সচেতনতার অঙ্গীকার। চন্দন সেনের আগামী নাট্যকৃতির দিকেও তাই বাঙালি নাট্যমোদী তাকিয়ে আছে।

## উপসংহার

আধুনিক বাংলা নাটক বিষয়ে এই প্রতিবেদনটি শেষ করার আগে দুটি কথা। এক নানা

অসম্পূর্ণতায় ভরপুর এই লেখায় প্রকাশিত মতামতে আমি ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা দেখাতে পারিনি। নাট্যকর্মী হিসাবে নাটকের কাজ করতে-করতে যেমন দেখেছি ও বুঝেছি, তাই লিখেছি। দুই, নিরপেক্ষ এবং সংবেদনশীল এবং সশ্রদ্ধ এবং পরিশ্রমী সেই গবেষক-সমালোচক কোথায় যাঁরা এ-কাজ ঠিকমত করবেন? পরিপূর্ণতর বিস্তৃততর কাঠামোয় রেখে বিচার করবেন বাংলা নাটকের? আধুনিক বাংলা থিয়েটার কি এইটুকুও দাবি করতে পারে না? সৃষ্টি করবেন যাঁরা, সমালোচনাও তাঁদেরই করতে হবে? একি বিড়ম্বনা! □